১১

দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন ইউরোপ

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে–

- পাঠ-১ : মহামন্দা
- পাঠ-২ : ফ্যাসিস্ট ইতালির উত্থান
- পাঠ-৩ : ফ্যাসিস্ট জার্মানির উত্থান
- পাঠ-৪ : স্পেনের গৃহযুদ্ধ

পাঠ - ১

মহামন্দা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- মহামন্দা কি জানতে পারবেন;
- মহামন্দার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মহামন্দার ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তী সময়ে একটি বড় সমস্যা হচ্ছে মহামন্দা (The Great Depression) অর্থনৈতিক মন্দা মানে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিপর্যয়, অর্থনীতির স্বাভাবিক গতিতে ছেদ। ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে এই মহামন্দার সূচনা হয়। এটা বিস্ময়কর যে, পাশ্চাত্যের কোনো নেতা বা অর্থনীতিবিদ ভাবতে পারেননি যে, অর্থনীতিতে এরকম একটি সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। উপরন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট হার্ভার্ড হুভার ১৯২৯ সালেই আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন এই বলে যে, "I have no fear about my country's future" এই আশাবাদ শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিরও ছিল। কিন্তু দেখা গেল ১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার মহামন্দার শুরু হয়। পাশ্চাত্যের সমকালীন ইতিহাসে এই দিনটি কালো বৃহস্পতিবার (Black Thursday) নামে পরিচিত। ঐ দিন নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রিট স্টক এক্সচেঞ্জটি (Wall Street Stock Exchange) হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যায়। শেয়ারের দাম এতই নিম্নগামী হয়েছিল যে, স্টক এক্সচেঞ্জটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন উদ্যোক্তারা। ঐতিহাসিক এ,এইচ কারের মতে, "১৯২৯ সালের শরৎকালে ইউরোপে মার্কিন ঋণের স্থগিতকরণ ছিল এ সংকটের প্রথম বহিঃপ্রকাশ এবং খুব শীঘ্রই সমগ্র বিশ্বজুড়ে ক্রয় ক্ষমতা একেবারে শুকিয়ে যায়– যার পরিণতি হল সার্বিক ও সর্বনাশা মূল্যহ্রাস।"

কেন মহামন্দা?

সাম্প্রতিক পৃথিবীর অর্থনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে জটিল বিষয়টি হল মহামন্দা। কতকগুলো কারণ ও সূচককে ভিত্তি করে গবেষকরা ১৯৩০ দশকের অর্থনৈতিক সংকটকে মহামন্দা বলে অভিহিত করেছেন।

প্রথমত, প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমৃদ্ধ ও পুঁজিবাদী দেশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরণ ঘটে। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশ তার উপর নির্ভরশীল ছিল। তাই যখন এই সমৃদ্ধ পুঁজিবাদী দেশে বিপর্যয় শুরু হয়, তখন সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তা ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় মহামন্দা। ঝড়ের বেগে এই অর্থনৈতিক সংকট গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে গ্রাস করে ফেলে।

দ্বিতীয়ত, রেনেসাঁসের পরবর্তীকালে পশ্চিমা বিশ্বে পুঁজিবাদের বিকাশ শুরু হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের একটি স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে, মাঝে মাঝে এতে মন্দা সৃষ্টি হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতি হচ্ছে সমৃদ্ধ ও সংকটের একটি চক্র, যার ফলে পালাক্রমে আসে মন্দা। যেমন ১৬২০–২৫-এ ইংল্যান্ডে মন্দা হয়। ১৮৭০ এর দিকে ইউরোপে মন্দা দেখা দেয়। উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিশ্ব এই মন্দা কাটিয়ে ওঠে। তবে আগের মন্দাগুলোকে ছাড়িয়ে যায় ১৯২৯ সালের মহামন্দা। এতবড় সংকট আগের মন্দাগুলোতে লক্ষ্য করা যায়নি। তখনএত কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়নি, এত বেকার সমস্যা দেখা যায়নি, ইউরোপ ও আমেরিকার নেতৃবৃন্দকে প্রচণ্ড অসহায় মনে হচ্ছিল।

কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সূচক প্রমাণ করে যে, এটি মহামন্দা ছিল। প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক ব্যবস্থার কথা বলা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৯–৩৫ সালে পাঁচ হাজার দেউলিয়া ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়। এর অর্থ হচ্ছে সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে যাওয়া।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় গাড়ি কোম্পানি ছিল জেনারেল মটরস (General Motors)১৯২৯ সাল পর্যন্ত এই কোম্পানি প্রতি বছর পাঁচ মিলিয়ন গাড়ি তৈরি করতো, কিন্তু ১৯৩২ সালে এতে দেখা যায় যে, কোম্পানি মাত্র ২০৫ মিলিয়ন গাড়ি তৈরি করে। অর্থাৎ দেশে ও বহিঃর্বিশ্বে তাদের বাজার পড়ে যায়।

এসব দৃষ্টান্ত শুধু যুক্তরাষ্ট্রে নয়, দেখা যাচ্ছে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ছোট ব্যাংকগুলোও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে জটিল ও কঠিন অবস্থা সৃষ্টি হয় জার্মানি ও অস্ট্রিয়ায়। অস্ট্রিয়ায় সবচেয়ে বড় ব্যাংক ক্রেডিট আনস্টল্ট (Credit Anstlat) দেউলিয়া হয়ে বন্ধ হয়ে যায় ১৯৩১ সালের মে মাসে। একই সময়ে জার্মানির সবচেয়ে বড় ব্যাংক ড্রামাস্টেডার (Dramstader) এবং ন্যাশনাল ব্যাংক (National Bank) দেউলিয়া হয়ে যায়। একইভাবে পুঁজিবাদী বিশ্বের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ওয়াল স্ট্রিট স্টক এক্সচেঞ্জ-এর ঘটনার প্রভাবে ভেঙ্গে পড়ে। পাশাপাশি এসব দেশের বাৎসরিক শিল্প উৎপাদনের হারও প্রকটভাবে কমে আসতে থাকে। সারণি এক-এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হলো।

সারণি-এক

বিভিন্ন দেশে শিল্পোৎপাদন পরিস্থিতি

বছর	শতকরা হার
১৯২৯	১০০%
১৯৩০	৮৬.০৫%
১৯৩১	৭৪.৮%
১৯৩২	৬৩.৮%

অথচ ১৯২৯ সালের আগে উৎপাদনের হার গড়ে ৭% বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছিল। সারণি এক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩২ সালে এসে উৎপাদন প্রায় ৩৭% কমে গিয়েছিল।

যখন কলকারখানায় উৎপাদন কমে যায়, একইভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও হ্রাস পায়। সারণি দুই-এ বিষয়টি তুলে ধরা হল।

সারণি-দুই

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা

বছর	বাণিজ্যের পরিমাণ
১৯২৯	৬৮.৬ বিলিয়ন ডলার
১৯৩০	৫৫.৬ বিলিয়ন ডলার
১৯৩১	৩৯.৭ বিলিয়ন ডলার
১৯৩২	২৬.৬ বিলিয়ন ডলার
১৯৩৩	২৪.২ বিলিয়ন ডলার।

সারণি– দুই-এ লক্ষ্য করা যায় যে, ক্রমাগতভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হ্রাস পাচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয় কত জটিল ছিল এই মন্দা। এই মহামন্দা অর্থনীতিবিদ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের নিকট

একটি জটিল ও রহস্যপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আছে। কারণ ২০ এর দশকের প্রথম দিকে পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশের অর্থনীতি ছিল স্বাভাবিক।

মহামন্দার কারণসমূহ

(ক) শিল্প খাতের প্রসার ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে শিল্প খাতের ব্যাপক প্রসার হয়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় পুঁজিবাদী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পখাতে উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। যখন যুদ্ধ বন্ধ হয়, তখনও অতি উৎপাদন চলতে থাকে। কিন্তু তখন বাজারের অভাব দেখা দেয়। ফলে শিল্পখাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়, নজিরবিহীন বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(খ) পুঁজিবাদের সংকট ঃ যখন কোনো পুঁজিবাদী বিনিয়োগকারী মুনাফা অর্জনের আশা দেখেন তখন সে বিনিয়োগ করে না, ফলে নতুন শিল্প স্থাপিত হয় না। দুষ্টচক্রের আবর্তে পড়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতি। এই দুটি সাধারণ লক্ষণের পাশাপাশি আরও কতগুলো গভীর ও সূক্ষ্ম কারণ ছিল।

এক. অভ্যন্তরীণ কারণ ঃ কৃষি পণ্যের আকস্মিক মূল্যহ্রাস

কেন কৃষি পণ্যের মূল্য কমে গেল? সহজে বলতে গেলে বলা যায়, অতি উৎপাদনের কারণে এই মূল্য হ্রাস ঘটে। যুদ্ধের সময়ে অন্যান্য খাতের মতো কৃষি খাতেও অতি উৎপাদন ঘটে। কিন্তু যুদ্ধের পর দেখা গেল চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি। যে কারণে কৃষি পণ্যের আকস্মিক মূল্য হ্রাস ঘটে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে উৎপাদন পদ্ধতিকে আধুনিকায়ন করা হয়। জরুরি পরিস্থিতিতে অনেক বেশি খাদ্য উৎপাদনের জন্যে যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়া হয়। প্রয়োজনের তাগিদে উদ্ভাবিত নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। যুদ্ধের পরও কিন্তু এই অতি উৎপাদন থেমে থাকেনি। ফলে কৃষিপণ্যের জন্যে বাজারের সংকট দেখা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও বাজার ছিল না। কারণ প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটেন ও ফ্রান্সের খাদ্যের প্রয়োজন ছিল না। ১৯৩০ সালের আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল খাদ্য ঘাটতির দেশ। কিন্তু ১৯৩০ সালে দেশটি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠে।

তখন যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল বাজার হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশ নির্বিশেষে কৃষিপণ্যের অতি উৎপাদন কৃষি পণ্যের আকস্মিক মূল্য হ্রাস সৃষ্টি করে।

দুই. আন্তর্জাতিক কারণ

যদি কিছু অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নেয়া হতো তাহলে ছয়তোবা পরিস্থিতি এত জটিল হতো না। বরং এর সাথে যুক্ত হয়েছিলো কতগুলো আন্তর্জাতিক কারণ। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুভারের আত্মজীবনী থেকে। হুভার হার আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, "অভ্যন্তরীণ কারণের সাথে কিছু আন্তর্জাতিক কারণ সংযুক্ত না হলে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে এই মহামন্দা কাটিয়ে উঠা যেতো।"

১৯৩১ সালের ৩১ এপ্রিল থেকে এই মন্দা পরিস্থিতির সাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলো যুক্ত হয়। এগুলো হলো–

(ক) ক্ষতিপূরণ ও আন্তঃমৈত্রীয় ঋণ ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে মিত্র ও সহযোগী শক্তির মধ্যে ঋণের আদান প্রদান হয়। তবে প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ অন্যান্য দেশগুলোকে ঋণ দিয়েছে। অন্যদিকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভেঙ্গে পড়া জার্মানিকে অর্থ সাহায্য ও ঋণ দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। তাই ক্ষতিপূরণ ও আন্তঃমিত্রশক্তি ঋণ মন্দা পরিস্থিতিকে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থাকে জটিল করে তোলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সংকটের ফলে ইউরোপীয় দেশগুলোর ঋণ লাভের সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছিলো। ফলে ব্যাংক সুদের হার বৃদ্ধি পায় ও শিল্পে বিনিয়োগের জন্য অর্থাভাব দেখা দেয়। নিম্নের চিত্রের সাহায্যে এই জটিলতাকে দেখানো যেতে পারে।

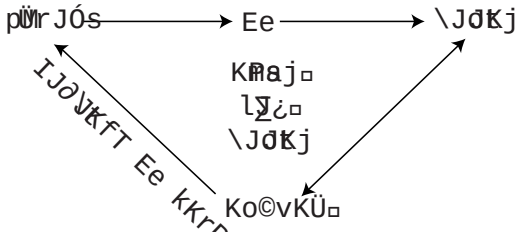

অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া টাকাই আবার যুক্তরাষ্ট্রে ফেরত আসছিলো, যার ফলে বিনিয়োজিত টাকার কোনো মুনাফাই যুক্তরাজ্য পায়নি। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পুঁজির সংকট দেখা দেয়।

(খ) অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ঃ এ সময়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এর ফলে অনেক খাদ্য ঘাটতির দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠে। ফলে খাদ্য রফতানিকারক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য রফতানি করতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্রে মন্দা পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার রক্ষা এবং সংরক্ষণ নীতি। ফলে এ সময় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ লক্ষণীয়ভাবে প্রকট ছিল। এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম দৃষ্টান্ত ছিল। বড় আকারে এবং কঠোরভাবে আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্যে ১৯৩০ সালে পাস হয় "স্মুট হলি আইন"। এ আইনে কৃষি পণ্যের আমদানির ওপর শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৪ শতাংশ করা হয়। অন্যান্য সাধারণ যে কোনো পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক ৩৩১/২ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করা হয়। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালি একই রকম আইন করে। যার ফলে আমদানি নিয়ন্ত্রণ এসব দেশে কঠোর হয়। ফলে অনুন্নত ও দরিদ্র দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মুখ থুবড়ে পড়ে, আর দীর্ঘায়িত হয় মহামন্দা।

(গ) আন্তর্জাতিক অর্থবাজার নিয়ন্ত্রণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনভিজ্ঞতা ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটেনের মুদ্রা পাউন্ড বিশ্ব অর্থনৈতিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করতো। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বরাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক বাজারের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। টিউডর

আমল থেকে প্রায় সাড়ে তিনশত বছরের অভিজ্ঞতা ছিল ব্রিটেনের। কিন্তু হঠাৎ করে বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পায় যুক্তরাষ্ট্র। এজন্যে অনেক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের এই অনভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব সংকট ঘনীভূত করতে সহায়ক হয়।

(ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক ব্যবস্থার ত্রুটি ঃ যুক্তরাষ্ট্র বিশাল ও সম্পদশালী একটি দেশ। ঐতিহ্যগত কারণে এবং নিজস্ব প্রয়োজন না থাকায় দেশটি বাইরের বিশ্বের সাথে সম্পর্ক রাখতে উৎসাহী ছিল না। কাজেই ব্যাংকগুলো অভ্যন্তরীণ বাজারের ক্ষেত্রে দক্ষ ছিল। কিন্তু যখন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্বের আসনে চলে আসলো, তখন এই ব্যাংক ব্যবস্থা নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম ছিল না।

পরিশেষে বলা যায়, যতটা না অভ্যন্তরীণ কারণ জড়িত ছিল, তারচেয়ে বেশি দায়ী ছিল আন্তর্জাতিক কারণ। এর সাথে প্রথম মহাযুদ্ধের সম্পর্ক তেমন একটা নেই। এটি সৃষ্টি হয়েছিল মূলত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সংকট ও দুর্বলতা থেকে।

মহামন্দার ফলাফল

মহামন্দার দুটো ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। একটি সামাজিক অন্যটি অর্থনৈতিক। সে সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশে বেকার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। এ ধরনের বেকার সমস্যা আগে আর কখনও দেখা যায়নি। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা ছিল ১৪ মিলিয়ন অর্থাৎ মোট শ্রমিকের একতৃতীয়াংশ বেকার ছিল। জার্মানিতে বেকারের সংখ্যা ছিল দুই-তৃতীয়াংশ এবং ব্রিটেনে ৩ (তিন) মিলিয়ন।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যারা এক নামে পরিচিত ছিল তাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। গোটা পশ্চিমী দুনিয়ায় অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়। যুদ্ধের ফলে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি এসব পরাজিত দেশের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। এসব দেশে জীবনকে বলা হতো জীবাস্মৃত (Living Death)।

রাজনৈতিক ফলাফল

সাধারণত একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক হয়ে গেলে রাজনৈতিক অবস্থাও হয়ে যায় জটিল ও সংকটময়। কারণ সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলে রয়েছে অর্থনীতি। বড় বড় পুঁজিবাদী দেশে রাজনৈতিক প্রভাব পড়ে দ্রুত। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন হার্ভাট হুভার। তিনি ১৯৩২ সালে নির্বাচনে ডেমোক্রেট এফ.ডি. রুজভেল্ট এর কাছে পরাজিত হন। অথচ হুভার ছিলেন আমেরিকার একজন জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি।

ইংল্যান্ডেও মহামন্দার কারণে একটি রাজনৈতিক তোলপাড় হয়েছিল। ঐ সময় ক্ষমতায় ছিল শ্রমিকদল। দু'বছর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে শ্রমিকদল নিজেদের সরকার বাতিল করে। সংকট মোকাবিলার জন্যে তৎকালীন শ্রমিকদল, কনজারভেটিভ পার্টি ও উদারপন্থী দল মিলে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠন করে। ইংল্যান্ডে এ সময় ফ্যাসিবাদী দলের সমর্থন বাড়ছিলো। কিন্তু জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশটি সংকট উত্তরণে সফল হয়।

ফ্রান্সের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে ঘন ঘন সরকার বদল হয়, কিন্তু মৌলনীতির কোনো পরিবর্তন হয় না। তখন ক্ষমতায় ছিল একটি বামপন্থী দল। ১৯৩২ সালে বামপন্থী সরকার বেকার সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হলে একটি কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায় আসে। ১৯৩৪-এ আস্থা-অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হয়– গণতন্ত্রের ক্ষতি না হলেও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়। একই সময়ে ফ্রান্সে ডানপন্থী ও ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলো শক্তি সঞ্চয় করে।

স্পেনে এ সময় ধর্মভিত্তিক, দক্ষিণপন্থী, সামরিক শক্তি ক্ষমতায় আসার জন্যে তুমুল আন্দোলন শুরু করে। এ কারণে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। ১৯৩৯ সালে গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করে জেনারেল ফ্রাংকো ক্ষমতায় আসেন।

মহামন্দার ফলে জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতা লাভ সহজ হয়। তবে মহামন্দার ফসল হিসেবে তিনি ক্ষমতায় যান ধারণাটি সঠিক নয়। ১৯১৯ সালে জার্মানির উপর যে অন্যায় চুক্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়

তার বিরুদ্ধে সত্যিকার প্রতিরোধ গড়ে তোলে নাৎসি দল। জার্মানির জনগণ এটাকে তাদের মৃত্যুর পরওয়ানা হিসেবে ধরে নেয়। জার্মানি রূঢ়ভাবে আক্রান্ত হওয়ার পর নাৎসিদলের জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে যায়। ১৯৩২ সালে মহামন্দার সময়ে নির্বাচনে হিটলারের জনপ্রিয়তার মাত্রা ছিল কম। কিন্তু ১৯৩৩ সালে তিনি ক্ষমতায় আসার পূর্বে জার্মানির উপর মিত্র শক্তির অবিচারের ইস্যুটিকে কাজে লাগান অর্থাৎ জনগণের নেতিবাচক সমর্থন লাভে সক্ষম হন তিনি।

মহামন্দার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচিত হয়। অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে একনায়কত্ব, ঘনীভূত হয় রাজনৈতিক সংকট এবং একনায়কদের আগ্রাসী নীতির কারণে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ( ) চিহ্ন দিন।

১। মহামন্দার সূচনা হয়েছিল ১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর–

(ক) রবিবার (খ) সোমবার

(গ) বুধবার (ঘ) বৃহস্পতিবার।

২। জেনারেল মটরস কোনো দেশের কোম্পানি–

(ক) যুক্তরাষ্ট্র (খ) ফ্রান্স

(গ) ব্রিটেন (ঘ) রাশিয়া।

৩। ক্রেডিট আনস্টল্ট কোনো দেশের ব্যাংক–

(ক) ব্রিটেন (খ) অস্ট্রিয়া

(গ) হাঙ্গেরি (ঘ) জার্মানি।

৪। মহামন্দার কারণে ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩২ সালে পাশ্চাত্য বিশ্বের শিল্পোৎপাদন কমেছিল–

(ক) ১৭% (খ) ২৭%

(গ) ৩৭% (ঘ) ৪৭%।

৫। মহামন্দার ফলে বেড়ে যায়–

(ক) চাকুরি (খ) ব্যবসা-বাণিজ্য

(গ) খেলাধূলা (ঘ) বেকার সমস্যা।

উত্তর ১। (ঘ), ২। (ক), ৩। (খ), ৪। (গ), ৫। (ঘ)।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মহামন্দা সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

২। মহামন্দার কারণগুলো বিশ্লেষণ করুন।

৩। মহামন্দার ফলাফল কি হয়েছিল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. E.Lipson: *Europe in 19th and 20th Century.*

২. R.O. Paxton: *Europe in the Twentienth Century.*

৩. ই.এইচ.কার: দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস (বাংলা একাডেমি)

পাঠ - ২

ফ্যাসিস্ট ইতালির উত্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থানের পটভূমি জানতে পারবেন;
- ফ্যাসিস্ট দল গঠন, ফ্যাসিস্ট কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মুসোলিনির ক্ষমতা দখল এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি জানতে পারবেন;
- মুসোলিনির পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ইতালিতে গণতন্ত্রের পতন এবং স্বৈরতন্ত্রবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তির উদ্ভব প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ঘটনা। যুদ্ধ-পরবর্তী ইতালির অবস্থা নানাদিক থেকেই শোচনীয় ছিল। দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব এবং শিল্পে অনগ্রসরতার কারণে ইতালির জনসাধারণ এক ধরনের হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। তারা উদারপন্থি সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। ইতালিবাসী এমন একটি সরকার চেয়েছিল যা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সক্ষম হয়। এই পরিস্থিতিতে ইতালিতে সর্ব্বকবাদী এবং উগ্র চরমপন্থী দল হিসেবে ফ্যাসিস্ট দল ক্ষমতা দখল করে।

এক. ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের কারণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিই ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থানের জন্য দায়ী ছিল। এর কারণগুলো ছিল নিম্নরূপ:

সাম্রাজ্য বিস্তারের আশায় ইতালি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগ দিয়েছিল। মিত্রপক্ষ অঙ্গীকার করেছিল যে ট্রেনটো, ট্রেয়েস্ট, ফিউম এবং ডালমাশিয়া উপকূলে ইতালির প্রাধান্য স্বীকৃত হবে এবং আলবেনিয়াকে ইতালির সংরক্ষিত দেশ হিসেবে গণ্য করা হবে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পর মিত্রপক্ষ

এসব প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পূরণ করেনি। ভার্সাই সন্ধি ইতালির সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে ক্ষতিপূরণ প্রশ্নেও ইতালিকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে ইতালির জনগণ ধরে নেয় যে, ভার্সাই সন্ধিরস্নারা তাদেরকে প্রতারিত করা হয়েছে, দাবি আদায়ে ব্যর্থ সরকার সাধারণ মানুষের চোখে অক্ষমতার প্রতীক হিসেবে প্রতীয়মান হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদীরা প্রচার করতে শুরু করে যে বর্তমান উদারপন্থী সরকার ইতালিবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অক্ষম। এভাবে ভার্সাই সন্ধি ইতালিতে এক উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবের জন্ম দেয় যা শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট শক্তিতে পরিণত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালিতে দারুণ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়, আর্থিক সংকট চরমে ওঠে এবং দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ ফেরত সৈন্য, কারখানা শ্রমিক, চাকুরিজীবীসহ সকলেই কাজের অভাবে বেকার হয়ে পড়ে। ফলে দেশে ধর্মঘট ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়। সমগ্র দেশব্যাপী শ্রমিক অসন্তোষ শুরু হয়। এই দুর্দশা মোকাবিলায় তৎকালীন উদারতন্ত্রী সরকার চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়।

ইতালিতে অর্থনৈতিক সংকটের সুযোগে সমাজতান্ত্রিক দল প্রচার করতে শুরু করে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই মুক্তির একমাত্র পথ। তাদের প্রচারণায় কৃষক ও শ্রমিকরা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। এর ফলে কৃষকেরা জমিদারদের কাছ থেকে জমি এবং শ্রমিকরা মালিকের হাত থেকে কলকারখানা দখল করতে শুরু করে। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। নিরন্তর ধর্মঘট, রাস্তাঘাটে খণ্ডযুদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নামে সর্বহারা শ্রেণীকে ক্ষেপিয়ে তোলার ফলে উদারতন্ত্রী সরকার অসহায় হয়ে পড়ে। ইতালির শিল্পপতি ও বুর্জোয়া শ্রেণী উদারতন্ত্রী সরকারের উপর আস্থা হারিয়ে একটি শক্তিশালী সরকারস্নারা তাদের স্বার্থ রক্ষার কথা চিন্তা করে।

দুই. ফ্যাসিস্ট দল গঠন এবং ফ্যাসিস্ট কর্মসূচি

ইতালিতে এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে আবির্ভাব হয় বেনিতো মুসোলিনির। ১৮৮৩ সালে মুসোলিনি উত্তর ইতালির রোমনাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন এবং এরপর তিনি ভাগ্যান্বেষণে সুইজারল্যান্ড চলে যান। সমাজতান্ত্রিক দলের সাথে যুক্ত থাকায় সেখান থেকে তিনি বহিষ্কৃত হন। দেশে ফিরে তিনি সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন এবং ১৯১২ সালে 'অভান্তি' নামে একটি সমাজতন্ত্রী পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে ইতালির যোগদান করাকে সমর্থন করায় সমাজতন্ত্রীরা তাকে বহিষ্কার করে এবং তিনি 'অভান্তি' থেকে বিতাড়িত হন। তখন তিনি নিজেই একটি পত্রিকা প্রকাশ করে ইতালির যুদ্ধে যোগদানের পক্ষে জনমত গঠন করতে থাকেন। এই সময় তিনি এ বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে মিলান শহরে যুদ্ধে কর্মচ্যুত সৈনিক এবং অন্যান্য দেশ প্রেমিক মানুষের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলনেই যুদ্ধ ফেরত বেকার সেনা এবং বেকার যুবকদের নিয়ে মুসোলিনি এক আধা সামরিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। তিনি এর নাম দেন ফ্যাসিস্ট। ফ্যাসিস্ট শব্দটি মূলত ল্যাটিন Fascio শব্দ হতে উদ্ভূত। Fascio কথাটির অর্থ হলো বল বা শক্তি। আবার এর অন্য অর্থ হচ্ছে আঁটি (Bundle)।

ফ্যাসিস্ট দলের নেতা বেনিতো মুসোলিনির মতবাদই ফ্যাসিবাদ। ফ্যাসিবাদ হলো একটি স্বতন্ত্র বিশ্বাস। ফ্যাসিবাদে রাষ্ট্রে ব্যক্তিসত্ত্বার কোনো মূল্য নেই এবং রাষ্ট্র, জাতি ও সমাজ হতে অভিন্ন এক সংগঠন। ব্যক্তিগত জীবনের উত্থান পতনে জাতীয় জীবনের গতি কোনোক্রমেই ব্যহত হয় না। ফ্যাসিবাদের মূলমন্ত্র 'রাষ্ট্রই সকল শক্তির আধার'। এক কথায় ফ্যাসিবাদে গণ-সার্বভৌমত্বের স্থান নেই। ফ্যাসিস্ট দলের কর্মসূচির মধ্যে ছিল শিল্পে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব, শ্রমিক কল্যাণে আইন প্রণয়ন, অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা জাতীয়করণ, চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, ধনিক শ্রেণীর উপর কর বসানো ইত্যাদি।

ফ্যাসিবাদীরা দেশবাসীর নিকট প্রাচীন ইতালির ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করার জন্যে আবেদন জানায়। এরা কমিউনিজ্‌ম এর বিরোধী ছিল। ফ্যাসিবাদীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কর্মসূচি বস্তুত

অগণতান্ত্রিক ও বিপ্লববাদী হলেও তা উগ্র জাতীয়তাবাদী ছিল। মুসোলিন ফ্যাসিবাদী আন্দোলনকে পার্টি বিহীন একটি জাতীয় আন্দোলন বলে অভিহিত করেন। ১৯১৯ সালের পর থেকে ফ্যাসিস্ট দল উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। যুব সমাজ ও সৈনিকরা এ দলের কর্মসূচির প্রতি আকৃষ্ট হয়। সামরিক কায়দায় দলের সংগঠন গড়ে ওঠে। মুসোলিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা থেকে দেশকে মুক্ত করবেন এবং কমিউনিজ্‌ম দূর করবেন। ফ্যাসিবাদীগণ কালো পোশাক পরতো এবং সামরিক কুচকাওয়াজ ও নিয়মানুবর্তিতা ফ্যাসিবাদী সংঘের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। সামরিক কুচকাওয়াজের ফলে ফ্যাসিবাদীদের মধ্যে সৈনিক সুলভ অভিজ্ঞতা ও যুদ্ধ মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে ফ্যাসিবাদীগণ একটি সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী গঠন করে। এরপর শুরু হয় ফ্যাসিবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ। সমাজতন্ত্রীদের সভা সমিতি ও এদের কার্যকলাপের উপর ফ্যাসিবাদীদের আক্রমণ চলে। প্রকাশ্যে সমাজতন্ত্রী নেতাগণকে ভীতি প্রদর্শন ও অনেক ক্ষেত্রে হত্যা করা হতে থাকে। সরকার পক্ষ নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করে প্রকারন্তরে ফ্যাসিবাদী আন্দোলনকে সহায়তা করতে থাকে। ১৯২০ সালে সমাজতন্ত্রী শ্রমিকরা ব্যাপক ধর্মঘটের মাধ্যমে কলকারখানাগুলো দখল করে নেয়। বলশেভিক বিপ্লবের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে না পারায় জনসাধারণ ফ্যাসিস্ট দলের মুখাপেক্ষী হয়। সমাজতন্ত্র বিরোধী শিল্পপতি, জমিদার ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অযোগ্য সরকার অপেক্ষা মুসোলিনির সমর্থনে এগিয়ে আসে। সম্রাট ভিক্টর ইমানুয়েলও পরোক্ষভাবে ফ্যাসিস্ট দলের প্রতি আস্থাবান হয়ে ওঠেন। ইতালির ধনিক শ্রেণী ফ্যাসিস্ট দলকে ত্রাণকর্তা মনে করে এই দলকে প্রচুর অর্থ সাহায্য দেয়। এভাবে ফ্যাসিস্টরা কমিউনিজম বিরোধী আন্দোলনে সাফল্য দেখিয়ে ধনিক শ্রেণীর সমর্থন ও সাহায্য লাভ করে দ্রুত শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

ফ্যাসিবাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল–
(১) রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করা;
(২) ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তি রক্ষা করা;
(৩) ইতালিকে বিশ্বরাষ্ট্রে উন্নীত করার উপযোগী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা এবং
(৪) দেশ থেকে সমাজতন্ত্র দূর করা।

তিন. মুসোলিনির ক্ষমতা দখল এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

১৯২২ সালে মুসোলিনি রাজধানী রোম দখলের জন্য হাজার হাজার ফ্যাসিস্ট স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে রোমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সরকারের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ফ্যাসিবাদ খুবই জনপ্রিয় ছিল। রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমান্যুয়েল সৈন্য বাহিনীকে এই বিদ্রোহীদের দমনের জন্যে নির্দেশনা দেয়ায় নির্বাচিত বৈধ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। ভিক্টর ইমান্যুয়েল মুসোলিনিকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এভাবে ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থান হয়।

মুসোলিনি প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসলেও পরবর্তীকালে তিনি একজন পরিপূর্ণ স্বৈরশাসকে পরিণত হন। মুসোলিনি জরুরি ক্ষমতার সাহায্যে সরকারি প্রশাসন ও অন্য সকল দপ্তরে ফ্যাসিকরণ নীতি চালু করেন। সকল বিরোধী দলকে কঠোর হাতে দমন করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিলুপ্ত করা হয়। নির্বাচন সংক্রান্ত আইনগুলো ফ্যাসিস্ট দলের অনুকূলে নতুন করে প্রণয়ন করা হয়। চেম্বার অফ ডেপুটিস নামক প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত করে ২২টি প্রতিষ্ঠানের একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়। ১৯২৫ সালে তিনি নেতা উপাধি নিয়ে ডিরেক্টরে পরিণত হন। মুসোলিনি সর্বময় ক্ষমতার অধীশ্বর হন।

চার. ফ্যাসিস্ট ইতালির পররাষ্ট্র নীতি

মুসোলিনির সময় ইতালির পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল ইতালির সম্প্রসারণ। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সকল সুযোগ নিয়ে ইতালির রাষ্ট্রীয় গৌরব বৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি স্থাপন করাই মুসোলিনির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মুসোলিনি ঘোষণা করেন যে, "ফ্যাসিস্ট ইতালির প্রধানতম কর্তব্য হলো ইতালির পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনীকে সকল সময়ের জন্য প্রস্তুত রাখা। এক মুহূর্তের মধ্যে

আমরা যাতে পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্যকে সামরিক সজ্জায় সজ্জিত করতে পারি। সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে তবেই আমাদের দাবি ও অধিকার স্বীকৃতি লাভ করবে।" মুসোলিনি যুদ্ধকেই তার পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে মনে করতেন। তিনি বলতেন "আমি যুদ্ধ ভালবাসি, যুদ্ধ করা আমার সহজাত প্রবণতা।"

সাম্রাজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনের পেছনে ইতালির যুক্তি ছিল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার স্থান সংকুলান করা। এছাড়া শিল্পোন্নয়নের জন্য ইতালির কাঁচামালের প্রয়োজন ছিল। ভার্সাই চুক্তিরস্নারা ইতালির প্রতি অবিচার করা, ইতালির ভৌগোলিক দাবি প্রভৃতিকে যুক্তি হিসেবে দাঁরা করান। সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যাপারে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয়কে পরস্পরের সাথে বিবাদে লিপ্ত করে, ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে জার্মানির বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানিকে সম্মিলিতভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে ইতালি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য স্থাপন করার ও সাম্রাজ্য বিস্তার করার নীতি গ্রহণ করে।

একথা অনস্বীকার্য যে, মুসোলিনির একনায়কতান্ত্রিক শাসনের প্রথম দশকে ইতালির আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইতালির পূর্বতন সরকারের অক্ষমতা হেতু ইতালি যে সকল ভূখণ্ড হারিয়েছিল মুসোলিনি তা উদ্ধার করতে সমর্থ হন।

১৯২৩ সালে জনৈক ইতালিয় সেনাপতিকে হত্যা করার অজুহাতে মুসোলিনি গ্রিসের কুর্ফূ দ্বীপ দখল করেন। শেষ পর্যন্ত **লীগ অব নেশনস** এর মধ্যস্থতায় তিনি মোটা ক্ষতিপূরণ নেন এবং গ্রিস ক্ষমতা প্রার্থনা করায় তিনি কর্ফু দ্বীপ গ্রিসকে ফিরিয়ে দেন। এই ঘটনার ফলে স্বদেশবাসীর কাছে মুসোলিনির মর্যাদা দারুণ বৃদ্ধি পায়।

১৯৩৩ সালে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি দল ক্ষমতায় আসে। মুসোলিনি হিটলারের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। মুসোলিনি আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত আবিসিনীয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স আফ্রিকা মহাদেশের সকল স্থান অধিকার করলেও একমাত্র আবিসিনিয়া ছিল তাদের সাম্রাজ্যবাদী থাবার বাইরে। ১৯২৩ সালে আবিসিনিয়ার জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করেছিল। ১৮৯৬ সালে ইতালি আবিসিনিয়া দখলের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এ্যাডোয়ার যুদ্ধে আবিসিনিয় ইতালিকে পরাজিত করে। মুসোলিনি এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার লক্ষ্যে আবিসিনিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা নেন। তিনি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের কাছ থেকে আবিসিনিয় আক্রমণের জন্যে গোপন সমর্থন পান। ১৯৩৪ সালে ওয়াল-ওয়াল নামক স্থানে ইতালি ও আবিসিনীয়া সেনাবাহিনীর মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হলে ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণের অজুহাত খুঁজে পান। ১৯৩৪ সালে ওয়াল-ওয়াল নামক স্থানে ইতালি ও আবিসিনিয়া সেনাবাহিনীর মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হলে ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণের অজুহাত খুঁজে পায়। আবিসিনীয়া এই ঘটনাটি লীগ কাউন্সিলের মধ্যস্থতার জন্যে উপস্থাপন করে। লীগ কাউন্সিল ঘোষণা করে যে, যেহেতু বিবদমান দুই রাষ্ট্রই ওয়াল-ওয়াল অঞ্চলটিকে নিজ রাজ্যভুক্ত বলে মনে করে তাই এই ঘটনার জন্যে কোনো পক্ষকেই দায়ী করা যায় না। জাতিপুঞ্জের কাউন্সিল আবিসিনিয়া সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান দানের পূর্বে ইতালি লীগের নির্দেশ অমান্য করে ১৯৩৫ সালে আবিসিনীয়া আক্রমণ করে। মূলত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ইতালিকে তোষণ করার নীতি অনুসরণের ফলে ইতালি লীগের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণে সাহস পায়। জাতিপুঞ্জ এ্যাসেম্বলী ইতালিকে যুদ্ধ অপরাধী ঘোষণা করে। ইতালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করে। ইতালি এই ঘটনার প্রতিবাদে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ ত্যাগ করে। ইতালি আবিসিনিয়াকে তার রাজ্যভুক্ত ঘোষণা করে। এই ঘটনা জাতিপুঞ্জের মর্যাদা অনেকাংশে নষ্ট করে এবং যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিফলতা প্রমাণ করে।

এরপর ইতালি আলবেনিয়া গ্রাস করার লক্ষ্যে ব্যাংক স্থাপন করে। আলবেনিয়ার বহুবিধ অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্যে ইতালি প্রচুর অর্থ সাহায্য দিয়েছিল। এভাবে ইতালি আলবেনিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পায়। ১৯২৫ সালে টিরানার সন্ধিরস্নারা আলবেনিয়া ও ইতালির মধ্যে যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর ফলে যুগোশ্লাভিয়া নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তিত হয়। ইতালি ও যুগোশ্লাভ সম্পর্কের অবনতি হয়। ইতোমধ্যে আলবেনিয়ার শাসক আহমদ জগু আলবেনিয়ার ক্ষমতায়

বসেন। তিনি ইতালি থেকে আলবেনিয়াকে মুক্ত করার চেষ্টা করলে মুসোলিনি ১৯৩৯ সালে আলবেনিয়া আক্রমণ করে।

১৯৩৬ সালে মুসোলিনি স্পেনের পপুলার ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সেনাপতি ফ্রাঙ্কোর পক্ষ নিয়ে স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট শাসন স্থাপন করে ফ্রান্সকে বেষ্টন করা। তাছাড়া মিত্র ফ্রান্সের সহায়তায় পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে ফ্রান্সের নৌ প্রতিপত্তি তিনি ধ্বংস করার কথা ভাবেন। এজন্যে স্পেনের পপুলার ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট সেনাপতি জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে স্পেনের শাসন ক্ষমতা লাভে মুসোলিনি প্রত্যক্ষ সহায়তা দেন। ফ্রান্স ও ব্রিটেন সহ ইউরোপের ২৭টি রাষ্ট্র স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নিলেও মুসোলিনি তা গ্রাহ্য করেননি। নাৎসি জার্মানি ও ইতালি স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কোর পক্ষ নেয়। জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনের গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করেন।

নাৎসি জার্মানির নেতা হিটলার মুসোলিনির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে এগিয়ে আসেন। হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রাঙ্কো বৃটিশ জোটের বিরুদ্ধে নাৎসি ফ্যাসিস্ট জোট গড়ে তোলা। জার্মানির ন্যায় ইতালিকেও ভার্সাই সন্ধিরস্নারা প্রতারিত করা হয়েছিল। কাজেই উভয়ে জোট করলে ভার্সাই স্থিতাবস্থা ভেঙ্গে ফেলা যাবে বলে হিটলার মনে করে। মুসোলিনি হিটলারের মৈত্রী প্রস্তাবে সাড়া দেন। আবিসিনীয়া যুদ্ধের সময় হিটলার ইতালিকে সমরাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। ১৯৩৯ সালে ইতালি ও জার্মানির মধ্যে একটি সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

পাঁচ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালির যোগদান ও পরাজয়

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যান্ডে জার্মান আক্রমণের প্রতিবাদে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মুসোলিনি জার্মানির ঘনিষ্ঠ মিত্র হলেও এই যুদ্ধে কিছুদিন নিরপেক্ষ থাকেন। কারণ মুসোলিনিকে অগ্রাহ্য করে নাৎসি নেতা হিটলার রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং এ্যান্টি-কমিন্টার্ন চুক্তিরস্নারা জার্মানি ও ইতালি কমিউনিস্ট রাশিয়ার বিরোধিতা করার জন্যে যে নীতি নেয়, হিটলার রুশ-জার্মান চুক্তিরস্নারা সেই নীতি থেকে বিচ্যুত হন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের গতি কোনো দিকে যাবে তা না বুঝে মুসোলিনি জার্মানির পক্ষে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণে উদ্যত হলে মুসোলিনি জানিয়ে দেন, আপাতত ইঙ্গ-ফরাসি মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে জার্মানিকে একাই যুদ্ধ করতে হবে। ইতালি এখন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত নয়। তবে শেষ পর্যন্ত হিটলারের অনুরোধে জার্মানির কারখানায় কাজ করার জন্যে কিছু শ্রমিক এবং কৃষিক্ষেত্রে কাজ করার জন্যে মুসোলিনি কিছু কৃষক পাঠান।

হিটলার পোল্যান্ডের যুদ্ধ শেষ করে ডেনমার্কও সুইডেন দখলের পর ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ডানকার্কের যুদ্ধে ইংল্যান্ডের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ফ্রান্সের ভেতর জার্মান বাহিনী ঢুকে পড়লে ফ্রান্সের পতন আসন্ন হয়। এতদিন মুসোলিনির ধারণা হয় যে, মিত্রশক্তির পরাজয় ঘটতে চলেছে। মুসোলিনি জার্মানির সঙ্গে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এইভাবে ইতালি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুন হিটলার ও মুসোলিনি মিউনিক-এর বৈঠকে মিলিত হন। মুসোলিনি নীস, কর্সিকা, ফরাসি সোমালিল্যান্ড, তিউনিসিয়া ও মাল্টা দাবি করেন। ২২ ও ২৫ জুন যথাক্রমে ফ্রান্স ও জার্মানি এবং ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে যুদ্ধ বিরতির শর্তাদি স্বাক্ষরিত হয়।

ইতালি বাহিনীর ক্রমাগত পরাজয়, জনসাধারণের যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব, নাৎসি জার্মানির প্রতি ইতালিবাসীর ঘৃণা, অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকট, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিক শ্রেণীর অসন্তোষ প্রভৃতি কারণে মুসোলিনি ও ইতালির পতন আসন্ন হয়ে ওঠে। ১৯৪৩ সালের ১০ জুলাই মিত্রপক্ষ সিসিলি আক্রমণ করে এবং একই সময় রোম বিধ্বস্ত করে। Facist Grand Council মুসোলিনি ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং মুসোলিনিকে বন্দি করা হয়। জার্মানি মুসোলিনির সাহায্যে অগ্রসর হয়। মুসোলিনিকে মুক্ত করে জার্মান বাহিনী ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন নির্মমভাবে দমন

করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু ১৯৪৫ সালে মিত্রপক্ষ উত্তর ইতালি আক্রমণ করলে ইতালিবাসী পুনরায় মুসোলিনির উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং মুসোলিনিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ইতালি মিত্রপক্ষের নিকট বিনা শর্তে আত্মসমর্পন করে। এভাবে ফ্যাসিবাদী ইতালির পতন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ( ) চিহ্ন দিন।

১। ১৮৮৩ সালে মুসোলিনি জন্মগ্রহণ করেন উত্তর ইতালির–

(ক) রোমে (খ) রোমানাত

(গ) ফ্লোরেন্সে (ঘ) ভিনাসে।

২। মুসোলিনি সম্পাদিত পত্রিকার নাম–

(ক) সানডে টাইমস (খ) ইকনমিস্ট

(গ) অভান্তি (ঘ) ভোগান্তি।

৩। বিশের দশকে ইতালির সম্রাট ছিলেন–

(ক) গ্যারিবল্ডি (খ) ভিক্টর ইমানুয়েল

(গ) অল্যান্ডো (ঘ) ক্যাভুর।

৪। ইতালি চূড়ান্তভাবে আলবেনিয়া দখল করে–

(ক) ১৯৩৪ সালে (খ) ১৯৩৮ সালে

(গ) ১৯৩৯ সালে (ঘ) ১৯৪০ সালে।

৫। মুসোলিনি নিহত হন–

(ক) ১৯৪১ সালে (খ) ১৯৪২ সালে

(গ) ১৯৪৪ সালে (ঘ) ১৯৪৫ সালে।

উত্তর ১। (খ), ২। (গ), ৩। (খ), ৪। (গ), ৫। (ঘ)

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ইতালিতে ফ্যাসিস্ট দলের উত্থানের পটভূমি আলোচনা করুন।

২। বেনিতো মুসোলিনির উত্থান, ক্ষমতা দখল এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিশ্লেষণ করুন।

৩। মুসোলিনির পররাষ্ট্র নীতির বিবরণ দিন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. E.Lipson Europe in the 19th & 20th Century.

২. R.O. Paxton, Europe in the Twentienth Century.

৩. Robert E. Lerner, Western Civiliazation, Vol.1

৪. অসিত কুমার সেন: আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস

৫. ই.এইচ.কার, দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস (বাংলা একাডেমি)।

পাঠ - ৩

নাৎসি জার্মানির উত্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- জার্মানিতে হিটলারের উত্থান ও নাৎসি দলের ক্ষমতা দখলের বিষয়টি জানতে পারবেন;
- জার্মানিতে নাৎসিদলের উত্থানের পেছনের কারণগুলো জানতে পারবেন;
- জার্মানিতে হিটলারের অভ্যন্তরীণ সংস্কার সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- হিটলারের সম্প্রসারণনীতি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পটভূমি জানতে পারবেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দ্রুত পতন ঘটে। জার্মানিতে গণতন্ত্রের পতন এবং স্বৈরতন্ত্রবাদী নাৎসি শক্তির উদ্ভব গোটা ইউরোপের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জার্মানিতে ভাইমার সরকারের বিভিন্ন দুর্বলতা ও সংকট নাৎসিবাদের উত্থানের পথ প্রশস্থ করে। তদুপরি ১৯৩০ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব জার্মানিকে ব্যাপকভাবে গ্রাস করেছিল। খাদ্যাভাব দেখা দেয়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব বাড়ে। দেশটির পুনরুজ্জীবনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা চরমে ওঠে। নেতিবাচক রাজনীতির জন্যে এটা ছিল মোক্ষম সুযোগ। হিটলার এবং তার নাৎসি দল এ সুযোগে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এভাবে জার্মানির জাতীয় জীবনের সংকটময় পরিস্থিতিতে নাৎসি দলের উত্থান ঘটে।

জার্মানিতে হিটলারের উত্থান এবং নাৎসি দলের ক্ষমতা দখল

১৮৯৯ সালের এপ্রিল মাসে অস্ট্রিয়ার ব্রাউনাউ গ্রামে অ্যাড্‌লফ হিটলার জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অ্যালোয়েস ছিলেন শুল্ক বিভাগের কর্মী, মা ক্লারা সাধারণ কৃষক নারী। বাল্যকালে পিতাকে হারিয়ে অনেক ভাই-বোনের সঙ্গে হিটলারেরও জীবন কেটেছে চরম দুঃখ দারিদ্র্যে। লাসবাক, লিনৎস ও স্টেইয়ারে বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে তিনি ভিয়েনায় ছবি আঁকার স্কুলে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি জার্মান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেন। যুদ্ধের শেষে তিনি মিউনিকে এক ছাপাখানায় কিছুদিন কাজ করেন। ১৯১৯ সালের মাঝামাঝি তিনি জার্মান শ্রমিক দলে

(German Workers Party) যোগ দেন। অল্প দিনের মধ্যে বাগ্মিতার জোরে তিনি এর নেতা হন। এই সময় দলের কোনো কর্মসূচি ও পরিকল্পনা ছিল না। তবে তারা ভার্সাই সন্ধির বিরোধী ছিল। দু'বছরের মধ্যে দলের সংগঠন সুদৃঢ় হয় ও সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। দলের নাম পাল্টে রাখা হয় জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদী জার্মান শ্রমিক দল (National Socialist German Wokers Party), সংক্ষেপে নাৎসি দল।

জার্মানির বিক্ষুব্ধ মানুষ নাৎসি দলে ভিড় করে– যুদ্ধে ফেরত সৈনিক, রক্ষণশীল রাজতন্ত্রী, দুর্দশাগ্রস্ত ব্যবসায়ী এবং হতাশ শ্রমিক। তদুপরি ক্যাথলিক-বিরোধী, ইহুদি বিরোধী, কমিউনিস্ট বিরোধীরাও নাৎসি দলকেই তাদের লক্ষ্যপূরণের হাতিয়ার বলে মনে করে। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি দলের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। একটি শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকার তিনি করেন। ভার্সাই সন্ধির বিরোধিতা ও জার্মান রক্তের বিশুদ্ধতার ওপর জোর দেওয়া হয়। সব শ্রেণীর মানুষের সমান কর্তব্য ও অধিকারের উল্লেখ করা হয়। শিক্ষা ও আইন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, ভূমি সংস্কার, শিশু ও মাতৃমঙ্গল, বার্ধক্য ভাতা, মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা– সব কিছুই এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হিটলার ড্রেক্সলারকে অপসারণ করে নাৎসি দলের নেতৃত্ব পুরোপুরি নিজের হাতে গ্রহণ করেন। গোয়েরিং, হেস, রোজেনবুর্গ, বোয়েম, গোয়েবল্‌স প্রমুখ সহকর্মীদের সাহায্যে তিনি দলকে শক্তিশালী করে তোলেন। দলের পতাকা ছিল রক্তবর্ণ এবং মাঝখানে সাদা রং এর মধ্যে শোভা পেত কালো স্বস্তিকা। লাল রং ধনতন্ত্র-বিরোধিতার প্রতীক, সাদা জাতীয়তাবাদ ও স্বস্তিকা আর্য রক্তের। প্রকাশিত হয় দলীয় মুখপাত্র 'পিপলস অবজার্ভার'। দলীয় স্বার্থরক্ষা ও নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তার জন্যে এক ঝটিকাবাহিনী গঠন করা হয়। এর নাম ছিল স্টর্মট্রুপার, সংক্ষেপে এস.এ। রোয়েমের নেতৃত্বে এই বাহিনী অন্যান্য দল বিশেষ করে কমিউনিস্টদের হাত থেকে দলের সভাগুলোকে রক্ষা করতো। অন্য দলের ওপর হামলা করাও তাদের কর্তব্য ছিল। বাদামি রং-এর পোষাক পরতো বলে এদের 'ব্রাউন শার্টও' বলা হয়। সংস্কৃতির বিশুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে এরাও স্বস্তিকা চিহ্ন ব্যবহার করতো। এছাড়া ছিল বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হিটলারের ব্যক্তিগত রক্ষী বাহিনী শুট্যস্‌স্টাফেল্‌ন, সংক্ষেপে এস.এস।

মাতৃভূমির জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই বাহিনীর সেনাগণ দল নেতার জন্যে মৃত্যুবরণ করতেও পিছপা হতো না। অন্যান্য নাৎসি কর্মীগণ জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক পরতো। তাতে শোভা পেতো সম্মানসূচক তারকারাজি। সুশৃঙ্খল ও দলবদ্ধভাবে তারা কুচকাওয়াজ করতো। বাস্তবে নাৎসি দল একটি সমান্তরাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলে।

দলীয় সঙ্গীত রচনা করেন হোর্স্ট ওয়েসেল নামে এক জার্মান যুবক। জার্মানির শক্তি ও সমৃদ্ধির কামনা করে ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দুটি সঙ্গীত রচিত হয়। নাৎসিদলের শ্লোগানগুলোর মধ্যে ছিল "উদ্দীপ্ত জার্মানি"। "ইহুদিগণ আমাদের দুর্ভাগ্য" "ক্যাথলিক নিপাত যাক" "ফুয়েরার (হিটলার) দীর্ঘজীবী হোন" "আজ জার্মানি, আগামীকাল বিশ্ব" ইত্যাদি।

হিটলার ১৯২৩ সালে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। প্রখ্যাত জার্মান সেনাপতি লুডেনডর্ফও এতে যোগ দেন। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। হিটলার পাঁচ বছরের জন্যে কারাদন্ডে দন্ডিত হলেও ন'মাস পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারাবাসের সময়েই তাঁর জীবনী মাইন কাম্ফ (Mein Kampf) রচিত হয়। এই গ্রন্থটিতে হিটলার তথা নাৎসি দলের মহাদর্শ প্রকাশিত হয়। নাৎসিগণের কাছে গ্রন্থটি ছিল বাইবেলের মতো তখনইনাৎসি দলকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। ১৯২৪ সালে নির্বাচনে দলের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায়। ১৯২৮ সালে অবশ্য এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির সঙ্গে নাৎসিদলের জনপ্রিয়তাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৩২ সালে নির্বাচনের পর রাইখস্ট্যাগের বৃহত্তম দল হিসেবে রাষ্ট্রপতি হিন্ডেনবুর্গ নাৎসিদলকে সরকার গঠনের আহ্বান জানান। হিটলারের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে নাৎসি দলের কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। হিটলার হন প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর। এই সময় হঠাৎ রাইখস্ট্যাগ ভবনে আগুন লাগলে হিটলার এর জন্য কমিউনিস্টদের দায়ী করেন। দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে রাজনৈতিক অধিকারগুলো খর্ব করা হয়। কমিউনিস্ট দল নিষিদ্ধ হয়। অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগে ১৯৩৩ সালে হিটলার কোয়ালিশন সরকার ভেঙ্গে দিয়ে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৪

সালে হিন্ডেনবুর্গের মৃত্যু হলে তিনি প্রেসিডেন্ট ও চ্যান্সেলর উভয় পদ দখল করেন। এরপর তিনি নিজকে ফুয়েরার বা নেতা ঘোষণা করেন।

হিটলার ও নাৎসি দলের উত্থানের কারণ

এক. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিজয়ী মিত্রশক্তির মতে, জার্মানি ছিল যুদ্ধাপরাধী। সুতরাং, বিভিন্ন শর্ত আলোচনার জন্যে জার্মানিকে প্যারিসের শান্তি বৈঠকে কোনো সুযোগ না দিয়ে একতরফাভাবে জার্মানির উপর ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলো চাপানো হয়। এই সন্ধিতে জার্মান সরকারকে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী ও নাৎসিদল এই সন্ধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং প্রচার চালায় যে, তৎকালীন সরকার ভার্সাই সন্ধিকে স্বীকার করে জার্মানির প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। দেশপ্রেমিক জার্মান, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও জনসাধারণের চোখে ভার্সাই সন্ধি ছিল জার্মানির প্রতি প্রতিহিংসামূলক কাজ। নাৎসি দলই ভার্সাই সন্ধিকে উপেক্ষা করে জার্মানির হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম এই ধারণা এ সময় জনমনে সৃষ্টি হয় এবং তাই তারা নাৎসি দলের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ভার্সাই সন্ধির কঠোর শর্তাবলীই জার্মানিতে নাৎসি দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছিল।

দুই. ১৯৩০-১৯৩৩ সালে জার্মানিতে কমিউনিস্টরা প্রচণ্ড প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু জার্মান রক্ষণশীলরা কমিউনিস্টদের পছন্দ করতো না। জার্মান শিল্পপতি ও বুর্জোয়ারা জার্মানিতে কমিউনিস্ট বিপ্লবের আশংকায় অস্থির থাকতেন। যেহেতু দুর্বল ও সহনশীল জার্মান প্রজাতন্ত্রী সরকার কমিউনিস্টদের দমনে আগ্রহ দেখায়নি, তাই এ সকল ধনকুবের শিল্পপতিরা নাৎসি দলকে তাদের পরিত্রাতা মনে করে। নাৎসি স্বেচ্ছাসেবক ও ঝটিকা বাহিনী গঠন, নাৎসি প্রচারযন্ত্রকে জোরদার করার জন্যে জার্মান শিল্পপতিরা প্রচুর অর্থ প্রদান করেন।

জার্মান পুঁজিপতিদের অর্থে হিটলার এস.এস বা ঝটিকা বাহিনী গড়ে তোলেন। যুদ্ধ ফেরৎ বেকার সেনা ও বেকার যুবকদের নিয়ে গড়ে তোলেন জঙ্গি যুব বাহিনী। এই বাহিনীর সাহায্যে হিটলার কমিউনিস্টদের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষস্নারা তাদেরকে কোনোঠাসা করে ফেলেন। বল প্রয়োগ করে কলকারখানার শ্রমিক ধর্মঘট ভেঙ্গে দেন। এর ফলে জার্মান বুর্জোয়ারা নাৎসি দলের অনুগত হয়ে পড়ে। অর্থের সাহায্যে এবং বল প্রয়োগ করে নাৎসিরা ১৯৩৩ সালের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে।

তিন. ১৯২৯ সালের মহামন্দা ও জার্মানির মুদ্রাস্ফীতিজনিত বিপর্যয়কে হিটলার রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করেন এবং বিপর্যয় কাটাতে জার্মান বেকার, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক সকলকে বুঝান যে, নাৎসিরা ক্ষমতায় এলে এ সকল সমস্যার সমাধান তারা করবে। নাৎসিরা জার্মান কৃষকদের সকল প্রকার সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেয়। ছোট দোকানদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীকেও সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে সকল শ্রেণীর জনগণ হিটলারেরস্নারা আশ্বস্ত হয়ে নাৎসি দলের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

চার. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিকে একতরফাভাবে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ঘোষণা করে তার শাস্তি স্বরূপ যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে বলা হয়। জার্মানির নাৎসিদলের নীতিগত আপত্তি ছিল যে, নৈতিক কারণে জার্মানি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়। যুদ্ধের জন্যে শুধু জার্মানি দায়ী ছিল না, মিত্রশক্তিও দায়ী ছিল। তারা আরও বলে যে, বেকার সমস্যা, খাদ্য সংকট, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি দূরাবস্থার কারণে জার্মানি কোনো মতেই ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে না। নাৎসি দলের এই ঘোষণাকে জার্মানি বুদ্ধিজীবী, জনসাধারণ ও জাতীয়তাবাদী দল সমর্থন করে এবং হিটলারকে একমাত্র মুক্তিদাতা মনে করে।

পাঁচ. হিটলারের নাৎসি প্রচার যন্ত্রগুলো জার্মান জাতীয়তাবাদকে তীব্রতর করার জন্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার ব্যাপক প্রচার চালায়। জার্মানরা আর্যজাতির বংশধর এবং শ্রেষ্ঠ জাতি। এই তত্ত্ব সর্বদা তারা প্রচার করে। এর সাথে তীব্র ইহুদি বিদ্বেষ প্রচারিত হয়। জার্মান শিশুদের ইহুদি বিদ্বেষী শিক্ষা দেওয়া

হয়। জার্মান যুবশক্তি এই সমস্ত প্রচারে আত্মহারা হয়ে হিটলারকে শ্রেষ্ঠ মানব মনে করে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হিটলার তার নাৎসিবাদের পথকে আরও প্রশস্ত করেন।

ছয়. নাৎসি বিপ্লবের পাশ্চাতে নাৎসি নেতা হিটলারের অবদান ছিল সর্বাধিক। ভেঙ্গে পড়া জার্মানজাতিকে তিনি তার নেতৃত্ব ও ভাষণের সম্মোহনী শক্তিতে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেন। তিনি জার্মান জাতির পূর্ব গৌরবের কথা সকল সময় বলে জাতির মনোবল বাড়াতে সক্ষম হন। ফলে জার্মান যুবশক্তি হিটলারকে মুক্তিদাতা হিসেবে ভাবতে শুরু করে। হিটলার তার সহকর্মীদের বাছাই করার সময় তাদের বংশ কৌলিণ্য দেখেননি। তিনি তাদের গুণ ও তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখেন। তার এই সম্মোহনী শক্তিরস্নারা তিনি নাৎসিদলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন।

হিটলারের অভ্যন্তরীণ সংস্কার

কোনো গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে হিটলার ক্ষমতায় আসেননি। তার জনপ্রিয়তা থাকলেও রাইখস্ট্যাগে (জার্মান আইন সভা) তার দল প্রথম দিকে ছিল সংখ্যালঘু। সমসাময়িক জার্মান নেতৃবৃন্দের দুর্বলতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস দেশটিতে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল, হিটলার সেই অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিলেন।

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে হিটলার জার্মান আইন সভার অনুমোদন ছাড়াই আইন প্রণয়ন ও শাসন কার্য পরিচালনা করতে থাকেন। প্রাদেশিক পরিষদ বা ডায়েট বিলোপ করে তিনি এককেন্দ্রিক শাসন কাঠামো গড়ে তোলেন। জার্মানির শক্তিবৃদ্ধির জন্যে তিনি চেয়েছিলেন সর্বক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে।

অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে তিনি শিল্প, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কৃষি কার্য, কর্মসংস্থান প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব দেন। শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে একদিকে যেমন ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার হরণ করা হয়, অন্যদিকে শ্রমিকের কাজের সময় হ্রাস করে বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। শ্রমিক কল্যাণে সারাদেশে শ্রমিক সংঘ গড়ে ওঠে। বহু অস্ত্র কারখানা স্থাপিত হওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কৃত্রিম উপায়ে পেট্রোল, পশম, রাবার প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কাঁচামালের বন্টন নিয়ন্ত্রিত হয়। কয়লা, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি ভারি শিল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়।

হিটলারের সম্প্রসারণ নীতি ঃ সমরসজ্জা

হিটলারের মূল লক্ষ্য ছিল ভার্সাই-এর অভিশাপ থেকে মুক্ত করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জার্মানির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা তাঁর প্রতিটি ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে। ১৯২৫ সালে পরবর্তী বছর লোকার্নো চুক্তিসমূহ স্বাক্ষর করায় জার্মানিকে জাতিপুঞ্জের (League of Nations) সদস্য করা হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে জার্মানি এর সদস্যপদ ত্যাগ করে। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে পারস্পরিক সামরিক শক্তির পরিমাণ নিয়ে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। আত্মরক্ষার স্বার্থে উভয়েই উভয়ের চেয়ে অধিক পরিমাণ সামরিক শক্তি অর্জন করতে চায়। কোনো সমাধান না হওয়ায় জার্মানি সম্মেলন ত্যাগ করে ও নিজের প্রয়োজন মতো শক্তি সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করে। ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলো ভঙ্গ করে হিটলার ফ্রান্সের কাছ রথকে আলসাস-লোরেন ও সার অঞ্চল ও পোল্যান্ডকে দেওয়া ডানজিগ ও পোলিশ করিডোর ফেরত চান। পোল্যান্ডের উর্বর কৃষিভূমি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউক্রেন অঞ্চলের ওপর তাঁর নজর ছিল। বৃহত্তম জার্মানি গড়ার আশায় অস্ট্রিয়ার জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চল ও চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতানল্যান্ড-ও তিনি দাবি করেন। তাঁর মতে, জার্মান ঐক্য আন্দোলনে অস্ট্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত না করে বিসমার্ক ভুল করেছিলেন। জার্মান হিসেবে হিটলারের কর্তব্য সেই 'ঐতিহাসিক ভ্রান্তিকে' সংশোধন করা।

১৯৩৪ সালে সবাইকে অবাক করে দিয়ে হিটলার পোল্যান্ডের সঙ্গে দশ বছরের অনাক্রমণ চুক্তি করেন। এই চুক্তির ফলে জার্মানির জঙ্গি মনোভাবের আশঙ্কা থেকে ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গ মুক্ত হয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পোল্যান্ডকে বিচ্ছিন্ন করে ফ্রান্সকে দুর্বল রাখা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভার্সাইয়ের শর্ত ভঙ্গ করে হিটলার জার্মানির সঙ্গে অস্ট্রিয়াকে সংযুক্ত করার উদ্যোগ নেন। এই সংযুক্তিকরণের প্রচেষ্টা ইতিহাসে আনস্লুজ (Anschluss) নামে পরিচিত। অস্ট্রিয় চ্যান্সেলর ডল্‌ফাস (Dollfuss) নাৎসি ঘাতকের হাতে নিহত হন। জার্মান সেনা অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগে

মুসোলিনি অস্ট্রিয়াকে রক্ষার জন্যে সেনা প্রেরণ করে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে হিটলার পিছিয়ে আসেন। ইউরোপের সব রাষ্ট্র অপচেষ্টাকে ধিক্কার জানায়। ভার্সাইয়ের শর্ত অনুসারে ১৫ বছর পর সার অঞ্চলে গণভোট হওয়ার কথা। ১৯৩৫ সালে এ উপলক্ষে প্রস্তুতি শুরু হয়। নাৎসিগণ সেখানে জোর প্রচারকার্য শুরু করলে অন্যান্য রাষ্ট্রবর্গ আতঙ্কিত হয়। ইংল্যান্ডের প্রস্তাবমত কয়েকটি নিরপেক্ষ ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সামরিক তত্ত্বাবধানে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সার-এর অধিবাসীগণ জার্মানির সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষে মত প্রকাশ করলে দীর্ঘদিন পরে তারা মিলিত হন। ১৯৩৬ সালে মার্চে হিটলার সৈন্যমুক্ত রাইনল্যান্ড অধিকার করেন। এইভাবে ভার্সাই সন্ধির আঞ্চলিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিধানগুলো হিটলার একের পর এক অস্বীকার করতে থাকেন।

এর পরই হিটলার ভার্সাই সন্ধির সামরিক শর্তাদিও ভঙ্গ করা শুরু করেন। ভার্সাই-এ স্থির হয়েছিল জার্মানি এক লক্ষ স্থলসেনা এবং ছোট নৌবহর রাখতে পারবে। জার্মানির বিমান বাহিনী রাখা নিষিদ্ধ করা হয়। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসার পর জার্মানি ৩৫ ডিভিশন সেনা গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তি প্রবর্তিত হয়। অস্ত্রসজ্জায় জার্মানি অন্যান্য রাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যায়। রণতরী, ট্যাংক, বিমান, কামান প্রভৃতির উৎপাদন ছাড়াও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, সাঁজোয়া গাড়ি, মোটর সাইকেল বাহিনী, বিস্ফোরক বোমা প্রভৃতির সাহায্যে সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ সম্পন্ন হয়। নাৎসি সরকারের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা ড. সাকেট জার্মান অর্থনীতিকে অস্ত্রসজ্জার প্রয়োজনে পরিচালিত করেছিলেন। জার্মানি প্রস্তুত হচ্ছিল সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্যে।

হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানির বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছিল কয়েকটি নাৎসি তত্ত্ব ও কিছু বাস্তব প্রয়োজনের সমন্বয়ে। নাৎসিগণ বিশ্বাস করতো জার্মানগণই প্রকৃত শাসক জাতি। কারণ আর্য জাতি পৃথিবীতে সর্বোত্তম এবং নর্ডিকগণ আর্যদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। খাঁটি ও বিশুদ্ধ রক্তের জার্মানরাই হচ্ছে নর্ডিক। সুতরাং, জার্মান জাতির কর্তব্য তাদের অধীনে ইউরোপে একটি নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। শুধু তাই নয়, বলা হলো, প্রাচ্যের নিম্নজাতিগুলোকে জয় করে জার্মানদের দাসত্বের কাজে লাগানো হবে। দক্ষিণ আমেরিকাসহ সমগ্র বিশ্বে এই আধিপত্য প্রসারিত করা প্রয়োজন। একদিন আসবে যখন তৃতীয় রাইখের অধীনে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠবে যা ইংরেজ সাম্রাজ্যের স্থলাভিষিক্ত হবে। জার্মান দার্শনিক স্পেঙ্গলার এই তত্ত্ব প্রচার করেন। ইতিহাসে এটি হেরেনভোক তত্ত্ব (Herrenvolk Theory) নামে পরিচিত।

ক্রমবর্ধমান জার্মান জনসংখ্যার স্থান সংকুলানের জন্যে হিটলার ঘোষণা করেন যে, জার্মানির আরো ভূ-খণ্ড প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি চেকোস্লোভাকিয়া ও অস্ট্রিয়া দখলের পরিকল্পনা করেন। পোল্যান্ড নিরপেক্ষ থাকবে এটা ধরে নিয়েই তিনি এরপর ফ্রান্স আক্রমণের কথা চিন্তা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত রাশিয়া অধিকারেরও পরিকল্পনা করেন। এই তত্ত্ব লেবেনশ্রাম (Lebensraum) বা বাসভূমি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

হিটলার জার্মানভাষী সব মানুষকে বৃহত্তর জার্মানির শাসনাধীনে আনতে চান। এজন্যে শুধু অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতানল্যান্ড নয়, পূর্বতন হ্যাপসবুর্গ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সব অঞ্চল ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের জার্মান সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন।

জার্মানির ভৌগোলিক অবস্থান তার পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে। মধ্য ইউরোপে তার অবস্থানের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা জার্মানিকে আশঙ্কার মধ্যে রাখতো। সেজন্যে জার্মান জাতীয়তাবাদ জঙ্গি হতে বাধ্য। পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে সামরিক প্রয়োজন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল।

সর্বোপরি ভার্সাই ব্যবস্থাকে বাতিল করে জার্মান কর্তৃত্বের অধীন এক ইউরোপ গড়ে তোলার স্বপ্নে নাৎসিগণ বিভোর ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ফুয়েরারের গগণচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিশোধ স্পৃহা।

রোম বার্লিন অক্ষ চুক্তি -১৯৩৬

জার্মানি সকল প্রকার–বিশেষ করে লীগের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে আবিসিনীয় যুদ্ধে ইতালিকে সমর্থন জানায়। ফলশ্রুতিতে এর কিছুদিন পরে ফ্যাসিস্ট ইতালির সঙ্গে নাৎসি জার্মানি কমিউনিস্ট বিরোধী চুক্তি সম্পাদন করে। ক্রমে ঐ চুক্তি রোম-বার্লিন অক্ষ চুক্তিতে পরিণত হয়। রোম-বার্লিন অক্ষ চুক্তির গুরুত্ব এই ছিল যে, এ চুক্তিরস্নারা জার্মান ইতালি জোট ফ্রান্সকে বেষ্টন করে ফেলে। একই বছর নভেম্বরে হিটলার কমিউনিস্টদের বিরোধিতা করার জন্যে একটি চুক্তি (Anti-Comintern Treaty) করেন। এভাবে জার্মানি, ইতালি ও জাপান এই তিন রাষ্ট্রের এক জোট গঠিত হয়। ইতিহাসে এটা অক্ষ শক্তি নামে পরিচিত।

এরপর হিটলার চেকোস্লোভাকিয়ার দিকে নজর দেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতানল্যান্ড জেলাতে ৩.৫ মিলিয়ন জার্মান অধিবাসীরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিটলারের নির্দেশে সুদেতেন জেলায় নাৎসি তৎপরতা বাড়ে। হিটলার সুদেতেন অঞ্চল আক্রমণ করার হুমকি দিলে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানির যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কারণ ফ্রান্সে রুশ আত্মরক্ষা চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স ও রাশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়াকে জার্মান আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। নানা বাধা সত্ত্বেও জার্মান সীমান্তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি অজুহাতে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে নেন।

এরপর হিটলার একের পর এক নীতি গ্রহণ করে রাশিয়ার মিত্রতা থেকে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন এবং ১৯৩৯ সারের ১ সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যান্ড আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করলে ইঙ্গ-ফরাসি শক্তি জার্মানির বিরুদ্ধে ১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ( ) চিহ্ন দিন।

১। ১৮৯৯ সালে হিটলার জন্মগ্রহণ করেন–

(ক) জার্মানির বার্লিনে (খ) সুদেতানল্যান্ডে

(গ) অস্ট্রিয়ার ব্রাউনাউ গ্রামে (ঘ) জার্মানির বন শহরে।

২। হিটলার কাকে অপসারণ করে নাৎসি দলের নেতৃত্ব নেন–

(ক) গোয়েবলস (খ) হেস

(গ) রোজেনবুর্গ (ঘ) ডেক্সলার।

৩। হিটলারের আত্মজীবনীর নাম–

(ক) মেইন কার্ফ (খ) মেইন বুক

(গ) হলি বুক (ঘ) হাই কাম্ফ।

৪। জার্মানি জাতীয় আইন পরিষেরদ নাম–

(ক) ডায়েট (খ) রাইখস্ট্যাগ

(গ) কমন সভা (ঘ) কংগ্রেস।

৫। নাৎসি দলীয় জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন–

(ক) হিন্ডে বুর্গ (খ) হোর্স্ট ওয়েসেল

(গ) হিটলার (ঘ) রোমেল।

উত্তর ১। (ক), ২। (ঘ), ৩। (ক), ৪। (খ), ৫। (খ)

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জার্মানিতে হিটলারের উত্থান ও নাৎসি দলের ক্ষমতা দখলের বিষয়টি বর্ণনা করুন।

২। জার্মানিতে নাৎসি দলের উত্থানের পটভূমি নির্দেশ করুন।

৩। জার্মানিতে হিটলারের অভ্যন্তরীন সংস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

৪। হিটলারের সমরসজ্জা এবং ভূখণ্ড দখলের বিষয়টি বর্ণনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। Alan Palmer The Penguin Dictionary of Twentieth Century History.

২। J.H. Hayes Contemporary Europe Since 1870.

৩। ই, এইচ কার ; দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ইতিহাস (বাংলা একাডেমি)।

পাঠ - ৪
স্পেনের গৃহযুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- স্পেনের গৃহযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- স্পেনের গৃহযুদ্ধে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ তথা বিভিন্ন দেশের ভূমিকা সর্ম্পকে জানতে পারবেন;
- স্পেনের গৃহযুদ্ধের ফলাফল সর্ম্পকে জানতে পারবেন।

পটভূমি

ইউরোপের এক সময়ের শক্তিশালী দেশ স্পেন সব গৌরব, সমৃদ্ধি হারিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে এক দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সমাজ ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয় ধাঁচের। আঞ্চলিক বৈষম্য ও দ্বন্দ্ব ছিল ব্যাপক। শিল্প অনগ্রসরতার কারণে অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর। অযোগ্যতা, অর্থনৈতিকতা ও দুর্নীতি ছিল সর্বত্র দৃশ্যমান। ১৮৯৮ সালে দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের উপনিবেশগুলো হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় স্পেন তার শেষ মর্যাদাটুকু হারায়। ব্রিটেন জিব্রালটার দখল করে নিলে স্পেনের জাতীয়তাবাদী ও রক্ষণশীলরা ক্ষুব্ধ হয়। তাই প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হলে তারা স্পেনকে ব্রিটেনের বিপক্ষে এবং জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে বলে। অন্যরা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের প্রস্তাব করে। কিন্তু রাজা ত্রয়োদশ আলফোনসো এবং স্পেনের জাতীয় সভা কর্তেস (Cortes) নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। বৈদেশিক শক্তিগুলোর মধ্যে ইতালি ও জার্মানি জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রত্যক্ষ সমর্থন দেয়। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন দেশের উদারপন্থী জনগণ স্পেনের গণতন্ত্রী এবং বামপন্থীদের জোট সরকারকে সমর্থন দেয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক বিশ্বের তৎকালীন নেতৃস্থানীয় দেশ ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। বৈদেশিক শক্তিগুলোর মধ্যে ইতালি ও জার্মানি জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রত্যক্ষ সমর্থন দেয়। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন দেশের উদারপন্থী জনগণ স্পেনের গণতন্ত্রী এবং বামপন্থীদের জোট সরকারকে সমর্থন দেয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক বিশ্বের তৎকালীন নেতৃস্থানীয় দেশ ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে বিষয়টি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল।

প্রথম পর্যায় ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দুই দশক কালে স্পেনের রাষ্ট্রীয় জীবনে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল অস্থির, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, সামরিক একনায়কতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র এইসব বিপরীতধর্মী শাসন ব্যবস্থা একের পর এক প্রবর্তিত হয়। পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। একদিকে শ্রমিক আন্দোলনের মাত্রা অসম্ভব বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলে উগ্র প্রাদেশিকতা এক বিস্ফোরক অবস্থা সৃষ্টি করে। দেশের বাইরে মরোক্কোয় জাতীয়তাবাদীদের কাছে বিশ হাজার স্পেনের সৈন্য বন্দী হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে অনুমান করে রাজা আলফোনসো (Alfonso) স্পেনে সামরিক একনায়কতন্ত্র স্থাপনের ঘোষণা করেন। ১৯২৩ সালে জেনারেল প্রাইমো দে রিভেরা (Primo de Rivera) দেশব্যাপী সামরিক একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন।

দ্বিতীয় পর্যায় (১৯২৩-৩১ সাল) ঃ রিভেরার দমনমূলক সামরিক শাসন ক্রমশ জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। ১৯২৮ সালের পর গণবিক্ষোভ প্রবল হয়ে ওঠে। রিভেরা পদত্যাগ করলে (১৯৩০ সাল) স্পেনের পূর্বতন শাসনব্যাবস্থা বলবৎ হয় এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে প্রজাতন্ত্রীরা বিপুল ভোটে জয় লাভ করে এবং প্রজাতন্ত্রী দলের নেতা আলকালা জামোরা (Zamora) দেশে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে স্পেন প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন (ডিসেম্বর, ১৯৩১ সালে)।

তৃতীয় পর্যায় (১৯৩১-৩৬ সাল) ঃ স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকার একটি আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্র গঠনের পথে অগ্রসর হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রবর্তিত হয়। তদুপরি আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচি গৃহীত হয়। অভিজাতদের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং এই সব জমি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কিন্তু প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্পেনের বিভিন্ন দল ও সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি সাধন করতে পারে নি। একদিকে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি যেমন যাজক, রাজতন্ত্রীরা ও অভিজাতবর্গ প্রজাতন্ত্রের অবসান ও রাজতন্ত্রের পুনপ্রতিষ্ঠা কামনা করে অন্যদিকে উগ্র বামপন্থীরা বিশেষত সিন্ডিক্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকরণে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে আগ্রহী ছিল। ১৯৩৩ সালেয় নির্বাচনে উদারনৈতিকদের পরাজয় ঘটে এবং ক্যাথালিক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীদের সম্মিলিত দল জয়যুক্ত হয়। এই দলটির নাম (Catholic Popular Action Party)। ১৯৩৬ সালের ফ্রেরুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে স্পেনের রাজনৈতিক দলগুলি দু'টি বিবদমান গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ছিল বাম ও গণতান্ত্রিক পপুলার ফ্রন্ট ও অন্যদিকে ক্যাথলিক ও রাজতন্ত্রীদের মিলিত জাতীয় ফ্রন্ট। নির্বাচনে পপুলার ফ্রন্ট অধিকাংশ আসন দখল করে। ১৯৩৬ সালে এপ্রিলে ম্যানুয়েল অজানা রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলেন।

প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গৃহযুদ্ধের সূচনা ঃ বাম গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষমতা লাভের ফলে রাজতন্ত্রের সমর্থক কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনীর মনে প্রচন্ড ক্ষোভ সৃষ্টি করে। সমর নায়করা প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ স্পেনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি (Policy of No-Intervention) গ্রহণ করল। এর শর্তানুসারে স্পেনের বিবাদমান কোনো পক্ষকেই কোনোরূপ সাহায্য না করতে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রবর্গ সম্মত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইতালি, জার্মানি ও রাশিয়া গোপনে ও প্রকাশ্যে স্পেনের বিবদমান দুই পক্ষকেই সাহায্য করতে লাগল। এই অবস্থায় 'হস্তক্ষেপ নিবারণ কমিটি' (Non-Intervention Committee) স্পেনে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি ও জার্মানির চুক্তি অগ্রাহ্য করে ইতালির যুদ্ধজাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ করল এবং স্পেন থেকে বিদেশী স্বেচ্ছাসেবকদের অপসারণ করার নির্দেশ দিল। কিন্তু কার্যত কমিটির নির্দেশ ইতালি ও জার্মানি অগ্রাহ্য করল। জেনারেল ফ্রাঙ্কোও 'হস্তক্ষেপ নিবারণ' কমিটির নির্দেশ পালনে অসম্মতি প্রকাশ করলেন এবং ইতালি ও জার্মানির কাছ থেকে সাহায্য নিতে লাগলেন।

বিদ্রোহীরা মাদ্রিদ, ভ্যালেনশিয়া ও ক্যাটালিনিয়া বিপন্ন করে তুললে স্পেন সরকারের রাজধানী ভ্যালেনশিয়া থেকে বার্সিলোনায় (Barcelona) স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৩৭ সালে জানুয়ারি মাসে স্পেনের প্রেসিডেন্ট অজানা প্যারিসে পলায়ন করলেন এবং বার্সিলোনার সরকারি সৈন্যবাহিনী বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করে। হাজার হাজার স্পেনবাসী ও স্পেন সরকারের অনুগত সৈনিকরা ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই অবস্থায় স্পেনের প্রচলিত মন্ত্রিসভা জেনারেল ফ্রাঙ্কো ও তাঁর অনুগামীদের বাধা প্রদান করার সংকল্প ত্যাগ করলেন। স্পেন সরকারের সৈন্যবাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাপতি জেনারেল মিয়াজা (Miaza) শান্তির জন্য আবেদন করলেন। এর ফলে মাদ্রিদে কমিউনিস্টরা বিদ্রোহী হ'ল এবং যথেচ্ছভাবে এক সপ্তাহ ধরে হত্যাকান্ড ও গোলযোগ চলল। এই অবস্থায় সেনাপতি মিয়াজা মাদ্রিদ ত্যাগ করেন এবং ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে জেনারেল ফ্রাঙ্কো সসৈন্যে মাদ্রিদে বিনা বাধায় প্রবেশ করেন। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ফ্রাঙ্কো কর্তৃক স্থাপিত সরকারকে স্বীকার করে নেয়। এইভাবে স্পেনের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং স্পেনে একনায়কতন্ত্রী শাসন চালু হয়।

বিভিন্ন দেশের পরস্পর বিরোধী ভূমিকা ঃ স্পেনের গৃহযুদ্ধের চরিত্র ও গতিধারা ইউরোপের বিভিন্ন শক্তির পরস্পর-বিরোধী মনোভাব ও অবস্থানদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। ইউরোপীয় শক্তিবর্গের অবস্থান ছিল তিন প্রকার। (১) জার্মানি ও ইতালি সরাসরি বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করে প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চেয়েছিল। (২) ব্রিটেন ও ফ্রান্স স্ববিরোধী নীতি অনুসরণ করে এবং নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত মনোভাব গ্রহণ করে। (৩) ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সাধ্যমত সাহায্য দান করে।

ইতালি ও জার্মানির ভূমিকা ঃ ইতালি ও জার্মানি উভয়েই কয়েকটি কারণে বিদ্রোহী নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সামরিক উপকরণ ও সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করেছিল। **প্রথমত,** স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হবার ঠিক পূর্বে ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করে, কিন্তু ইতালিকে আক্রমণকারী সনাক্ত করা হলেও জাতিপুঞ্জ ইতালির বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। যৌথ নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিপুঞ্জের এই চূড়ান্ত ব্যর্থতা ইতালি ও জার্মানিকে স্পেনে হস্তক্ষেপ করতে উৎসাহিত করে। **দ্বিতীয়ত,** সমাজতন্ত্রী দলগুলি কর্তৃক সমর্থিত প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে যদি স্পেন থেকে উৎখাত করা যায় এবং সেখানে একনায়কতন্ত্রী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহ'লে স্পেনে জার্মানি ও ইতালির প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। **তৃতীয়ত,** অর্থনৈতিক দিক থেকেও ইতালি ও জার্মানি স্পেনের আকরিক খনিজ সম্পদ আহরণ করতে আগ্রহী ছিল এবং এরস্নারা নিজ নিজ দেশের আর্থিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল। **চতুর্থত,** এই গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এইসব দেশের প্রকৃত মনোভাব ও তাদের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনা যাচাই করার সুযোগ পাওয়া গেল। পরিশেষে বলা যায়, স্পেন যদি বিদ্রোহীপক্ষ জয়লাভ করে তাহলে ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা যাবে।

তবে ইতালি ও জার্মানি সমধর্মীয় মনোভাব নিয়ে স্পেনে হস্তক্ষেপ করেনি। ইতালিমূল উদ্দেশ্য ছিল সামরিক আর জার্মানির উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক। হিটলার একদিকে যেমন মূল্যবান আকরিক লৌহ ও তামা সংগ্রহ করে জার্মানির সামরিক প্রস্তুতির কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে স্পেনের গৃহযুদ্ধকে দীর্ঘসূত্রী করে ইউরোপের বিভিন্ন শক্তির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখতে পারলে জার্মানি মধ্য ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপে স্বচ্ছন্দ্যে সম্প্রসারণের দিকে এগুতে পারবে। ভূমধ্যসাগরীয় সংকটে পশ্চিমী-ইউরোপীয় দেশগুলি ব্যস্ত থাকায় হিটলার অবলীলাক্রমে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে দৃষ্টির অন্তরালে অথবা বিনা বাধায় সম্প্রসারণনীতি শুরু করার সুযোগ পাবেন। অধ্যাপক টেলর মনে করেন যে, হিটলার স্পেনের গৃহযুদ্ধে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর আপাত কূটনৈতিক লক্ষ্য ছিল ফ্রান্স ও ইতালির বন্ধুত্বে ফাটল সৃষ্টি করা। কারণ, স্পেনে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিজয়ই তার মূল লক্ষ্য ছিল না।

সোভিয়েত ইউনিয়ানের ভূমিকা ঃ সোভিয়েত ইউনিয়ান জার্মানি ও ইতালির মতই স্পেনের গৃহযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তবে তার লক্ষ্য ছিল প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহের হাত থেকে ক্ষমতাসীন প্রজাতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব রক্ষা করা। অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন আদর্শগত উদ্দেশ্যের চেয়ে নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকেই স্পেনের গৃহযুদ্ধে প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন করেছিল। স্পেনে ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ জয়যুক্ত হলে জার্মানি ও ইতালির শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সাধ্যমত সাহায্য দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, স্পেনের প্রজাতন্ত্রের সপক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে প্রয়াসী হয়েছিল। যদিও সোভিয়েত সাহায্যের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ছিল, সোভিয়েত সাহায্য না পেলে ১৯৩৬ সালের শেষ ভাগেই প্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ত এবং ঐ সরকারের পতন হতো তথাপি ১৯৩৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৩৬টি উড়োজাহাজ, ৬০,০০০ রাইফেল, ৩৭২৭ মেশিনগান সরবরাহ করে। সোভিয়েত বুদ্ধিজীবী রয় মেদভেদভ (Roy Medvedov) দেখিয়েছেন যে, ১৯৩৭ সালে থেকে সোভিয়েত সাহায্যের পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পায়। ১৯৩৮ সালে সাহায্যের পরিমাণ ছিল নগন্য। মেদভেদভ মনে করে যে, স্টালিন এই সময় রাশিয়ায় ব্যাপকহারে নির্মম দমন নিপীড়ন শুরু করেন, তাই স্পেনের গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রে নিস্পৃহ মনোভাব দেখান। মেদভেদভ এমনও ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে, স্টালিন ইচ্ছাকৃতভাবে স্পেনের ফ্যাসিস্ট বিদ্রোহকে বিধ্বস্ত করতে চাননি, কোনো রাশিয়া জার্মানির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে প্রস্তুত ছিল না। দুঃখের বিষয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশগুলি যদি ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতো তা'হলে শুধুমাত্র স্পেন সংকট থেকে মুক্ত হতো তা নয়, একনায়তন্ত্রী জার্মানিও ইতালির পক্ষে বিশ্বশান্তি বিপন্ন করা সম্ভব হতো না। স্পেনের ঐতিহাসিক ডি. স্মাইথের (D. Smyth) মতামত হলো যে, স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স সমর্থন করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পাশ্চাত্য বিশ্বের মধ্যে মৈত্রী গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ভূমিকা ঃ ব্রিটেন ও ফ্রান্স আনুষ্ঠানিকভাবে এই যুদ্ধে সতর্ক নিরপেক্ষতামূলক অবস্থান গ্রহণ করেছিল। ফ্রান্সের সহানুভূতি ছিল প্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রতি এবং দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে জার্মানির মিত্র ফ্রান্সের জয়লাভ ফ্রান্সের নিরাপত্তার পক্ষে উদ্বেগের কারণ ছিল। কিন্তু ফ্রান্সে এই সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল ছিল না, দক্ষিণপন্থী দলগুলি স্পেনে কমিউনিস্ট সমর্থিত প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা সহজভাবে মেনে নেয়নি। স্বভাবতই ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ব্লারম (Blurm) জাতীয় সংহতির স্বার্থে নিরপেক্ষ থাকার নীতি অনুসরণ করা বাস্তব সম্মত বলে মনে করেছিলেন। ফ্রান্সের মনে আরও ভয় ছিল। কেননা ফ্রান্স যদি প্রকাশ্যভাবে স্পেনে প্রজাতন্ত্রকে সমর্থন করে তাহলে ইতালি ও জার্মানির সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে। তাই ফ্রান্স বৈদেশিক যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট হতে ঝুকি নিতে রাজি ছিল না। ব্রিটেনেরও মনোভাব ছিল হস্তক্ষেপ-বিরোধী। ব্রিটেনের রাজনীতিতে রক্ষণশীল দলের প্রভাব ছিল ঢের বেশি, তারা স্পেনে কমিউনিস্ট সমর্থিত ও সোভিয়েত সাহায্য প্রাপ্ত প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিল। ইংল্যান্ডে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আই, মাইস্কি (I.Maisky) তাঁর প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন (১ নভেম্বর, ১৯৩৬ সাল) যে, ব্রিটিশ সরকার স্পেনে প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে সাহায্য দিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়। বরং তাদের ধারণা যে ফ্রাঙ্কো জয়লাভ করলে তার উপর প্রভাব বিস্তার করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ব্রিটিশ স্বার্থ সুরক্ষিত করা সম্ভব হবে।

ব্রিটেনও ফ্রান্স নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করার ফলে শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কোর জয়লাভ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক এ.জে.পি. টেলর মনে করেন, স্পেনে ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহের মূলে প্রধানত দায়ী ছিল ব্রিটিশ ও ফরাসি নিষ্ক্রিয়তা। টেলর মনের করেন যে, প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সহায় সম্পদ ও জনসমর্থন দুইই বেশি ছিল। যদি দুই বিবদমান পক্ষই বৈদেশিক সাহায্য পেতো অথবা দু'পক্ষই ঐ সাহায্য থেকে বঞ্চিত হতো তাহলেও প্রজাতান্ত্রিক সরকারের জয় অবধারিত ছিল।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভাষ ঃ স্পেনের গৃহযুদ্ধের বেদনাদায়ক অবসান ঘটলেও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এর গুরুত্ব ইঙ্গিতবাহী। স্পেনের গৃহযুদ্ধ সমগ্র মহাদেশে এমনকি সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অনেক ঐতিহাসিক স্পেনের গৃহযুদ্ধের আদর্শগত চরিত্রের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন- এ যুদ্ধকে সচরাচর গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্রের জীবন মরণ সংগ্রাম বলা হয়। অবশ্য বহিরঙ্গের দিক থেকে এই ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত মনে হলেও ফ্রাঙ্কের মূল সমর্থক ছিলেন সামরিক, ধর্মীয় ও ভূসম্পত্তির মালিককূল। এদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ফ্যাসিবাদী আদর্শের সহমত ছিল না। এছাড়া ১৯৩৯ সালে জয়লাভ করার পর ফ্রাঙ্কো আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপন্থী অবস্থান গ্রহণ করেন। ইতালি ও জার্মানির সাহায্যের প্রয়োজন না থাকায় তিনি ইতালি-জার্মানি কূটনৈতিক জোটে যোগদান করেন নি। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অন্য পক্ষকে সমর্থন করেন নি। প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও কোনো সুস্পষ্ট আদর্শগত সংহতি লক্ষ্য করা যায় না। উদারনীতির সমর্থক, সমাজতন্ত্রী, সাম্যবাদী, সন্ত্রাসবাদী, প্রজাতন্ত্রী-এসব বিভিন্ন মতাদর্শের সমর্থকরা প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পক্ষ গ্রহণ করে। রাজনৈতিক ও সামরিক রণকৌশল নিয়ে এদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের আপাতত ফলাফল হল প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিলুপ্তি ও ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে একটি প্রতিক্রিয়াশীল সমরবাদী রাজনীতির সাফল্য। কিন্তু স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রকৃত গুরুত্ব নিহিত ছিল স্পেনের বাইরে। এই গৃহযুদ্ধের ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ভ্রান্ত নিরপেক্ষতা নীতির ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠল এবং তাদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরাজয় প্রতিভাত হল। যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যত অচল বলে প্রতিপন্ন হল। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মনোভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্ষুব্ধ হল-এই দুই পক্ষের মধ্যে যোগসূত্র রচনার সম্ভাবনা নির্মূল হয়ে গেল। অধ্যাপক টেলর মন্তব্য করেছেন যে, স্পেনের গৃহযুদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়নও পশ্চিমা শক্তির মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি করেছিল।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে সবদিক থেকেই লাভবান হয়েছিল জার্মানি। ডেভিড টমসনের মতে, স্পেনের গৃহযুদ্ধে মুসোলিনীর চেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিলেন হিটলার। অথচ মুসোলিনি ফ্রাংকোকে বেশি সহায়তা করেছিলেন। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে হিটলার তাঁর সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিমান বাহিনীর দক্ষতা ও বিভিন্ন

মারণাস্ত্রের ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পেলেন। কূটনৈতিক দিক থেকে ইতালিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাছ থেকে সরিয়ে এনে জার্মানির মিত্রদেশে পরিণত করলেন। সর্বোপরি পশ্চিম-পূর্ব ইউরোপে ঝটিকা কেন্দ্রে অন্যান্য দেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকার সুযোগ নিয়ে হিটলার মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারে উদ্যত হলেন। এভাবে দেখা যায়, স্পেনের গৃহযুদ্ধ ইউরোপে একটি যুদ্ধজনিত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে প্রথম ইউরোপীয় সংঘাতের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। স্পষ্টই বোঝা গেল, ইউরোপে এখন এক বৃহৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল। বার্লিনে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত ফ্রাসোয়া পঁসে (Francois Poncet) ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বরে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলে ছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্তি বিরাজ করছে না বরং অঘোষিত যুদ্ধ চলছে। এ জন্যেই অনেকে স্পেনের গৃহযুদ্ধকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভাষ বলে অভিহিত করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের উপনিবেশগুলো হাতছাড়া হয়ে যায় কত সালে
(ক) ১৮৮০ (খ) ১৮৮৫ (গ) ১৮৯৮ (ঘ) ১৯৯০

২। ১৯২৩ সালে স্পেনে সামরিক শাসন জারি করেন কে ?
(ক) আলফনেসো (খ) প্রাইমো রিভেরা(গ) ফ্রাঙ্কো) (ঘ) ভালদেরো

৩। স্পেনে গৃহযুদ্ধের সময় সে দেশের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন ?
(ক) রিভেরা (খ) জিরাল (গ) ব্লুম (ঘ) মিয়াজা

৪। ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে কে স্পেনের গণতান্ত্রিক বা 'পপুলার ফ্রন্ট' সরকারকে সমর্থন করেছিল ?
(ক) সোভিয়েত ইউনিয়ন (খ) ব্রিটেন (গ) ফ্রান্স (ঘ) ইতালি।

উত্তর ১। (গ) ২। (খ) ৩। (গ) ৪। (ক)

রচনামূলক প্রশ্ন

১। স্পেনের গৃহযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২। স্পেনের গৃহযুদ্ধ প্রশ্নে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের সম্পৃক্ততার একটি বিশ্লেষণ দিন।
৩। স্পেনের গৃহযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা করুন।